আনন্দবাজার পত্রিকা
অনলাইন সংস্করণ
৮ পৌষ ১৪২৬, মঙ্গলবার ■ ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯

বাংলার মিষ্টি-মানচিত্র

সংস্কৃত 'মিষ্' ধাতুর অর্থ স্পন্দন বা সেচন। এর পথে 'ক্ত' প্রত্যয় যোগ করে হয় 'মিষ্ট', যার অর্থ সিক্ত বা রসযুক্ত। আর তাকে খাদ্যের উপযোগী করে তোলার চেষ্টায় জুড়ে দেওয়া হয় 'অন্ন' শব্দটি। এর পর থেকে তাবৎ বিশ্ববাসী জানেন, বাঙালি তাকে কেবল খাদ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেনি, একেবারে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টির দোকান যেন ল্যান্ডমার্ক। চেনার মতো সে রকমই কিছু স্থান ও স্বাদ মাহাত্ম্য খুঁজে আনা গেল।

চন্দননগরের জলভরা

সে দেড়শো বছর আগের কথা। শাশুড়ির শখ হল, নতুন জামাইকে একেবারে চমকে দেবেন। তবে ইনি তো আর যে-সে শাশুড়ি নন, রীতিমতো হুগলির তেলিনিপাড়ার বাঁড়ুজ্জে ঘরের জমিদার-গিন্নি। তাঁর আবদার রাখলেন চন্দননগরের সূর্য মোদক আর তাঁর ছেলে সিদ্ধেশ্বর। তালশাঁসের আদলে তৈরি হল প্রচণ্ড কড়াপাকের এক মিষ্টি, ভেতরে সুগন্ধী গোলাপজল। জামাই আর যায় কোথায়, এক কামড় দিয়েই গরদের পাঞ্জাবি ভিজে একাকার কাণ্ড! ইদানীং কালে জলভরা যে কলকাতাতেও পাওয়া যায় না তা নয়, তবে সে সবই নরম পাকে, এই মিষ্টি দাঁড় করালেই পেট ফেটে নলেন গুড় বেরিয়ে আসার আশঙ্কা। আর সূর্য মোদকের গোলাপজল আজও আসে সুদূর কনৌজ থেকে। আর থাকে চিনির রস। সূর্য মোদকের আমলে শুরু হলেও প্রথম জলভরার কাঠের ছাঁচ তৈরি করেছিলেন তাঁর নাতি ললিতচন্দ্র।

রানাঘাটের পান্তুয়া

নোয়াখালিতে তখন দাঙ্গা চলছে, ট্রেনে করে সেই পথে পাড়ি দিচ্ছেন গাঁধীজি। পথে রানাঘাট। অনেক কাজ, তবু হরিদাস পালের পান্তুয়ার স্বাদ থেকে সে যাত্রাতেও বঞ্চিত হননি বাপু। আবার, এলাহি মধ্যাহ্নভোজের পরে যুবক রবীন্দ্রনাথকে পান্তুয়া দিয়েই আপ্যায়ন সেরেছিলেন কবি নবীন সেন। সেই উৎসব নাকি আজও পালন করে রানাঘাট। হ্যাঁ, সেই পান্তুয়া— বাটা ছানা গোল করে পাকিয়ে ভেতরে ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলে ওপরের লাল রং হয়, তার পর রসে ফেলতে হয়। 'বাংলার খাবার'-এ প্রণব রায় লিখছেন, "ঘিয়ে আস্তে আস্তে ভাজলে ভেতরের জালি বেশ ভালো হয়।" আর সেই জগতেই বাঁকুড়ার শিমলাপাল কিংবা বীরভূমের সিউড়ির মতো কুলীন নদিয়ার রানাঘাট। যদিও তার আদি উৎস নাকি মেদিনীপুর! সেই জেলার ঠাকুরের হাত ধরেই রানাঘাটের জমিদার পালচৌধুরীদের বাড়িতে পান্তুয়ার প্রবেশ। সম্ভবত সে জন্যই কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির নোড়া পান্তুয়ার সঙ্গে এর এত মিল। সে-ও মেদিনীপুরের হালুইকর বামুনের ভাজা। মিষ্টিরসিকেরা জানেন, লেডিকেনি বা কালোজামের থেকে রঙে এটা কতটা আলাদা, স্বাদে কতটা নরম।

কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া

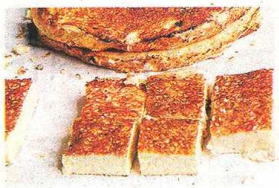

কৃষ্ণনগরের চকেরপাড়া, বাঘাডাঙা এলাকায় ঘরে ঘরে 'ঘোষ'। আর সে কালের গোয়ালারা সর দিতেন— একটা কিনলে একটা ফ্রি! দুধ ফুটিয়ে মেরে আঁচ থেকে নামিয়ে তার পর সর খোঁজার পালা। প্রথম সরটা পুরু ধবধবে, পরেরটায় লালচে আভা। চারতলা সরপুরিয়ায় নীচে-ওপরে সাদা সর, মাঝে দু'টো লাল খাঁজ। সে দিন গিয়েছে। সর উধাও, খাঁজও। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে প্রচলিত এই মিষ্টান্নের ভেতরে থাকত খোয়াক্ষীর, চিনি, কাঠবাদাম, পেস্তা, ছোট এলাচ, মিছরির গুঁড়ো, জাফরান। আর আজ সে জায়গায় অবশিষ্ট কেবল ছিটেফোঁটা বাদাম, মশলা। তবু বিজয় মোদকের চালাঘর বা অধরচন্দ্র দাসের দোকানে আজও সর ছাড়া সরপুরিয়া হয় না। সরপুরিয়ার আবার এক মানিকজোড় আছে: সরভাজা। সে-ও খাঁজের সরের মিষ্টি, আভিজাত্য-কৌলীন্য তারও সমান।

বহরমপুরের ছানাবড়া

১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন বহরমপুর গিয়েছিলেন, তখন নাকি তাঁকে একমন ওজনের ছানাবড়া উপহার দেওয়া হয়েছিল। আবার, স্বাধীন ভারতে রাজীব গাঁধী সেখানে গেলে অভ্যর্থনা জানানো হয় তাঁর সমান ওজনের ছানাবড়ায়!

চোখ ছানাবড়া হওয়ার মতোই ব্যাপার। আসলে, এই খাবারটাই সম্ভবত মেগা-সাইজ়। এর প্রভাবও যে প্রচণ্ড কড়া হওয়ারই কথা ছিল। দুই শতক আগে, বহরমপুরে যখন রমরমা সোনার কারবার, তখন এর এক দল নেশাভূকে তৃপ্ত করার জন্য এর উৎপত্তি। গয়নায় মিনের কাজ করতেন যাঁরা, তাঁদের অনেকের ছিল গুলির নেশা। তার পর মিষ্টির দরকার হতই। হাঁটুতে মেখে রাখা চিটেগুড় কোনও রকমে খেয়েই ঘুম দিতেন তাঁরা। কিন্তু তাতে আর কত দিন চলে? অগত্যা কড়া মিষ্টির পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। কড়া বলে কড়া! যেন ছানার গোলায় এলাচ আঁটা চিনি, একেবারে কড়া ভাজা ছানা-পোড়া গন্ধে তীব্র মিষ্টির ধাক্কা। তবে পুড়ে যাওয়া খোলটা বাদ দিয়ে খাওয়াই দস্তুর।

বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা

বর্ধমানের মহারাজ নাকি এক বার ভৈরবের কাছে জানতে চান, ছানার সঙ্গে ময়দার সেমাই মিশিয়ে ঘিয়ে ভাজা কোনও মিষ্টি তৈরি করা যায় কি না। রাজার বচন আসলে নির্দেশ। এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে ভৈরব বানিয়েও ফেলেন। চালের গুঁড়ো আর ছানা মিশিয়ে গোলা তৈরি করে তা ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে গরম ঘিয়ে ফেলে ভেজে নিয়ে চিনির রসে ডোবাতে হয়, পরে রস ঝরিয়ে তুলে নিতে হয়, তবে ভাজার সময় যেন রং না বদলায়। মহারাজ এর নাম দেন সীতাভোগ। আর তার দোসর মিহিদানা। বেসন, সবেদা, ঘি, চিনি দিয়ে সূক্ষ্ম দানার মিষ্টি। এতই সূক্ষ্ম, যে তার নামই হয়ে গেল মিহিদানা! এ দুই নাম একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে বর্ধমানের সঙ্গে। বিশেষত সে শহরের গণেশের দোকানের সঙ্গে। অন্য কিছু দোকানও এখন সমানে পাল্লা দিচ্ছে। সুতরাং, ও পথে মিষ্টিপ্রেমীরা গেলে বা ফিরলে এক বার থামতে ভোলেন না।

বেলাকোবার চমচম

শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ির মাঝামাঝি জায়গায় উত্তরবঙ্গের এই ছোট্ট শহরের নাম পরিচিত হল স্রেফ চমচমের দৌলতে। রেলগেট পেরিয়ে উদয় সরকারের দোকানে ঢুঁ মারলেই চোখে পড়বে লালচে শক্তপোক্ত হাতের তালুর মতো আকারের চমচম। ওঁরা বলেন, দু'দিন পরেও নাকি দিব্যি তাজা থাকে এই মিষ্টি। এতখানি মোটা মিষ্টি, প্রায় নিখাদ ছানা, ছিটেফোঁটা ময়দা। এই উত্তরাধিকার কিন্তু একান্ত ভাবেই ও পার বাংলার। উদয়বাবুর বাবা ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির মিষ্টির দোকানের কারিগর। দেশভাগের পর বেলাকোবায় চলে এসে নিজের দোকান চালু করেন। ওই অঞ্চলে প্রবীর পাল, জগদীশ পাল, সুকুমার দত্তের চমচমও বিখ্যাত। এই মিষ্টির প্রকৃত অধিকারী আসলে রাজশাহী, পাবনা, টাঙ্গাইলের উদ্বাস্তু কারিগরেরা।

বসিরহাটের মাখাসন্দেশ

এর বয়সের গাছপাথর আছে বলে মনে হয় না। ইদানীং মিষ্টি যে ছাঁচে না-ও ঢালা হতে পারে, আমরা ভাবতেই পারি না। কিন্তু তার আগেও একটা যুগ ছিল, যখন ঘাঁটা ছানার মিষ্টান্নও মিলত। এর স্বাদ আদি, অকৃত্রিম। এরই ডাকনাম মাখাসন্দেশ, ভাল নাম কাঁচাগোল্লা। মোলায়েম দানা-পাকের এই মিষ্টির জন্য এক সময় হুগলির সোমরাবাজার, বর্ধমানের কালনা, এবং অবশ্যই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বসিরহাটে পৌঁছে যেত কলকাতাবাসী। এ জিনিসও ও পার বাংলার, সাতক্ষীরার কারিগরদের থেকে শেখা। চেহারায় ধবধবে, দানা মিহি, মুখে দিলে মিলিয়ে যায়, এবং স্বাদে মৃদু মিষ্টি। কলকাতা থেকে যে যাত্রার দল সেখানে যেত, তাদের থেকেই শোনা যেত সুরুচি, রুচিরা, মায়া সুইটসের সুখ্যাতি। তবে এক দোকানের কর্তার আক্ষেপ, এখন আর

দুধে সেই ক্রিমভাব নেই। অতএব সন্দেশের গুণাগুণও পাল্টে গিয়েছে।

জয়নগরের মোয়া

সরু ধানের খইয়ের সঙ্গে গুড় বা চিনির রস মাখিয়ে তৈরি হয় মুড়কি, সেটাকে গোল করে বাঁধাই করলে মোয়া। তাতে অবশ্য এলাচ, কর্পূর, কিসমিস, পেস্তা ইত্যাদি দিতে হয়। না হলে সুস্বাদু আর সুগন্ধী হবে কী করে! এই মোয়া জগতেরই বনেদি ঘর হল জয়নগরের মোয়া। সুন্দরবন অঞ্চলে সরু সুগন্ধী জাতের কনকচূড় ধান হয়, তার খই দিয়ে তৈরি হয় জয়নগরের মোয়া। অন্য কোনও ধানের খই চলে না। সঙ্গে নলেন গুড়, গাওয়া ঘি, কর্পূর, কাবাবচিনি। ধানের মতোই গুড় আর ঘিয়ের ব্যাপারেও খুঁতখুঁতে হতে হয়। তবে আসল-নকলের জাঁতাকলে পড়ে এই ছেলেভোলানো মিষ্টির কৌলীন্য অস্তমিত। আমতলা, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার বা কালীঘাটে কি খাঁটি 'জয়নগরের' মোয়া মিলতে পারে!

মালদহের রসকদম্ব

ঠিক যেন কদম ফুলের ভেতর একটা রসগোল্লা। ওপরে ক্ষীরের মোটা প্রলেপ, সারা গায়ে জড়ানো চিনি মাখানো পোস্ত দানা। শোনা যায়, সুলতান হুসেন শাহের আমলে গৌড়ে গিয়েছিলেন চৈতন্যদেব। সেখানকার তেলিকদম্ব গাছের তলায় রূপ-সনাতনকে দীক্ষা দেন তিনি। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, সেই কদম্বগাছ থেকেই রসকদম্বের উৎপত্তি। তাই বৈষ্ণবদের কাছে রসকদম্ব হল অমৃতের সমান। অবশ্যই বিশ্বাস ছাড়া এর আর কোনও ভিত্তি নেই।

বেলিয়াতোড়ের ম্যাচা, জনাইয়ের মনোহরা

দুইয়ের গায়েই কাচের মতো চিনির পাতলা কোটিং। স্থানীয় দেবতা ধর্মরাজ বা দুর্গাপুজোয় বাঁকুড়ার

বেলিয়াতোড়ের মোদকেরা যে মোয়া পাকাতেন, পরে তা-ই ম্যাচা নামে পরিচিত হয়। ও নামের মিষ্টি অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়, তবে খাঁটি জিনিসটা মিলবে দুর্গাপুর ও বাঁকুড়া শহরের ঠিক মাঝখানে ২১ কিলোমিটারের মাথায় অবস্থিত বেলিয়াতোড়েই। চন্দ্রলোক বা ছিদাম মোদকের এই সৃষ্টি বিলেতেও পৌঁছেছে। এর সঙ্গে মনোহরার তফাত কেবল মালমশলায়। রেফ্রিজারেটর-পূর্ব যুগের এই মিষ্টির মোড়কটাই আসল রাজা— একেবারে যেন ডিমের খোলার মতো একটা বর্ম। ওপরের চিনি ছাড়িয়ে ভেতরে যে তুলতুলে সন্দেশটা পাওয়া যায়, তা ঘুঁটের আঁচে এলাচ-বাদাম-পেস্তায় পাক দিয়ে তৈরি।

সিউড়ির মোরব্বা

মিষ্টির দোকানে বয়ামে বয়ামে সাজানো আচার-মোরব্বা, এই দৃশ্য একমাত্র সিউড়িতেই দেখা সম্ভব। বেল, আম, হরিতকি, আমলকি থেকে শতমূলী, আপেল, আনারস, পটল, লঙ্কা— তৈরি এই জিনিস। শোনা যায়, সন্দেশ-রসগোল্লার অনেক আগেই কাশী-বৃন্দাবন থেকে এ জিনিস তৈরি শিখে নেন সিউড়ির মোদকেরা। মোরব্বার কর্তা নন্দদুলাল দে-র পূর্বপুরুষ হরিপ্রসাদ নাকি মুকুন্দ নামে কাশী-ফেরত এক কারিগরকে ধরে আনেন। মোরব্বার একেবারে সমবাদার হয়ে ওঠেন রাজনগরের রাজারা। রাজা মহম্মদ-উল-জামি খান বা আলি নকি খান নাকি এন্তার বেল-চালকুমড়ো খেতেন। তা থেকে মোরব্বার জনপ্রিয়তা। তবে বাঁশের কপি, গাজর, নাসপাতি, আদা-উচ্ছেও চিনির রসে সেদ্ধ হয়ে দিব্যি মোরব্বা হয়ে ওঠে।

পুনশ্চ: বাংলার মিষ্টি মানচিত্র ঘনবসতিপূর্ণ। প্রত্যেক সাত মাইল অন্তরই মিলবে কিছু না কিছু বিশেষ মিষ্টি। কোনওটা স্বাদে স্বর্গীয়, কোনওটা বা আজ কেবল নামেই কাটে, কেউ হারিয়েই গিয়েছে। কিন্তু অল্পে ঠাঁই দেওয়া মুশকিল। তাই আপাতত মুলতুবি রইল মেদিনীপুরের বাবরশা, কাঁথির কাজু সন্দেশ, কামারপুকুরের সাদা বোঁদে ইত্যাদি। বেদনাহত হয়েও বাদ দিতে হল অতি-জনপ্রিয় শক্তিগড়ের ল্যাংচাও। অতএব, শেষ হয়ে শেষ হল না, অন্তরে কিছু অতৃপ্তিই না হয় রইল।

আবাহন দত্ত